বাংলাদেশের দন্ডবিধি (Penal Code)ঃ একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

মোঃ হাসিবুর রহমান *

ভূমিকা ঃ

দন্ডবিধিকে Substantive Law বা মূল আইন বলা হয়। এটি অপরাধের শাস্তি প্রদানের আইন। ঐ আইনকে কার্যকর করার জন্যই মূলত Crpc বা ফৌজদারী কার্যধারা প্রয়োজন হয়। অবশ্য কয়েকটি ধারার ক্ষেত্রে (যেমন ১০৭, ১৩৩, ১৪৪ ইত্যাদি) ফৌজদারী কার্যধারাও মূল আইন হিসেবে কাজ করে থাকে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যধারা দন্ডবিধি বা পেনাল কোডকে বাস্তবায়ন করার জন্য প্রসিডিউর হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই সিআরপিসি-কে 'এ্যাডজেকটিভ ল' বা 'প্রসিডিউরাল ল' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। যেমন সমন, ওয়ারেন্ট ক্রোকী পরোয়ানা ইত্যাদি জারী করে আসামীকে আদালতে হাজির করা ইত্যাদি। তারপর আসে সাক্ষ্য আইনে সাক্ষীর প্রশ্ন। এইগুলির মাধ্যমে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়, অন্যদেরকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ সংশোধন করা যায় ঠিকই, কিন্তু দেওয়ানী আদালতের দেওয়ানী আইনের মত কোন ক্ষতি পূরণ আদায়ে দন্ডবিধি মূলত ব্যবহৃত হয়না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দন্ডবিধিও ক্ষতিপুরণ আদায়ে আংশিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আপীলের আগে দেখা হয় আসামী দোষ করেছে কি করেনি। দোষ করলেই নিম্ন আদালত শাস্তি দিয়ে থাকে। আপীলের আদালত বিবেচনা করে কোন্ অবস্থায় দোষ করা হয়েছে। অবস্থা বিচার করে আসামীকে অনেক সময় খালাস দেয়া হয় বা শাস্তি কমিয়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনের প্রকৃত অবস্থা বিচার্য হয়। অনুরূপ অবস্থা হলে হাকিম হয়তো নিজেও

---

* পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

সেই দোষ করে বসতেন। নিম্ন আদালত যা খোঁজে না উপরের আদালত তা আপীলের সময় খুঁজে থাকে। বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের দুইটি ডিভিশন, আপীল ও হাইকোর্ট ডিভিশন। আপীলেট ডিভিশন প্রধানত স্পষ্টতার অভাবে আইনের ও শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার প্রশ্ন হলে, কারো মৃত্যুদন্ড হলে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড হলে এবং হাইকোর্টের দ্বারা সম্পাদিত হাইকোর্ট অবমাননার মামলা হলে আপীল গ্রহণ করতে পারেন।

মৌলিক অধিকার খর্ব হওয়ার প্রশ্নে হাইকোর্ট অরিজিনাল মামলা গ্রহণ করতে পারেন বা অন্যের রিপোর্টে নিম্ন আদালত হতে মামলা তুলে আনতে পারেন। অন্য সব ক্ষেত্রে এটি আপীল গ্রহণ করে থাকেন। সুপ্রীম কোর্টেরও আপীলে বলবৎ রাখা মৃত্যুদন্ড মহামান্য রাষ্ট্রপতি (বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শক্রমে) মওকুফ করতে পারেন। যেখানে রাষ্ট্রপতিও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন, বৃটেনের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বা প্রিভি কাউন্সিলের লর্ড চ্যান্সেলর (ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ভারতে যা আপীলের একমাত্র আদালত ছিল) তা অনুধাবন করতে সক্ষম হতে পারেন। তাই কমনওলেথ এর অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সেখান থেকে আসতে পারে। এইভাবে বাংলাদেশ পেনাল কোড দ্বারা শাস্তি বিধান, দন্ড মওকুফ, হ্রাস ও দন্ড বহাল রাখার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

২। অপরাধ

দন্ডবিধিতে যে কোন প্রমাণিত অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তির কথা লেখা আছে, সর্বনিম্ন শাস্তির উল্লেখ নাই। সর্বনিম্ন শাস্তি হাকিমের বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে। ১৮৩৩ সালে লর্ড মেকলে এই দেশের আইন প্রণয়ন আরম্ভ করেন এবং ইংল্যান্ডের অনুকরণে আইন ও শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করেন। দন্ডবিধি লর্ড মেকলে কর্তৃক ১৮৬০ সালের ৬ই অক্টোবর প্রণীত হয় এবং ১লা জানুয়ারী ১৯৬২ সাল থেকে কার্যকর হয়। দন্ডবিধি অনুসারেই সমস্ত অপরাধের শাস্তি প্রদান করা হয়। এখানে অপরাধ বলতে ফৌজদারী অপরাধ বা যে অপরাধের জন্য সংশোধন, অপরাধ দমন, অপরাধ প্রতিরোধ এবং অপরাধের প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু অপরাধের জন্য ভুক্তভোগী ব্যক্তি যা হারালো বা যার প্রতি অপরাধ করা হয়েছে, তা দেওয়ানী মামলার মত আর ফেরত আসবে না।

দন্ডবিধি ধারা ২এ অপরাধের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে; প্রত্যেক ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অত্র বিধির বিধানসমূহের পরিপন্থী যে কার্য বা বিচ্যুতির জন্য দোষী গণ্য হবে, তার প্রত্যেক কার্য ও বিচ্যুতির জন্য এই বিধির অধীনে এবং প্রকারান্তরে নহে, দন্ডনীয় হবে। অর্থাৎ দন্ডবিধি অনুসারে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে তা করলে এবং যা করতে আদেশ করা হয়েছে তা না করলেই 'অপরাধ' হবে।

৩। দন্ডবিধি ও ফৌজদারী কার্যবিধি

অন্য সজ্ঞায় অপরাধ বলতে যত অন্যায় এবং ক্ষতিকর কাজই বুঝানো হোক না কেন, দন্ডবিধি অনুসারে এই বিধির বিরুদ্ধে কিছু করাটাই অপরাধ। দন্ডবিধির সঙ্গে ফৌজদারী কার্য বিধির নিম্নোক্ত পার্থক্যসমূহ রয়েছে ঃ (১) দন্ডবিধি ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারেই বাস্তবায়িত হয়, দন্ডবিধি Substantive Law বা মূল আইন এবং ফৌজদারী কার্যবিধি Procedural Law or Adjective Law. দন্ডবিধি কিভাবে কার্যকর করা যাবে সে সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধি পথ বাতলিয়ে দেয়। এই বিধিতে অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হয়, কিন্তু দেওয়ানী কার্যবিধি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়। দন্ডবিধিতে ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায় না। অবশ্য 'কোয়াসি ক্রিমিন্যাল কেস'এ ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায়। যেমন, বাপকে পাগল বলে মেয়ের বিয়ে নষ্ট করা, হাত কেটে সক্ষম ব্যক্তিকে অক্ষম করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে।

(২) ফৌজদারী আদালতে দন্ডবিধি অনুসারে বিচার হয় আর দেওয়ানী আদালতে দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসারে বিচার হয়। মানহানি, আক্রমণ, উদ্দেশ্যেমূলক অপমান প্রভৃতি মামলা দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার আদালতেই করা যায়। মানহানির জন্য মেয়ের বিয়ে ভাল জায়গায় না হলে তার জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায়। আক্রমণে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পঙ্গুত্ব এলে ক্ষতিপুরণ দাবী করা যায়। তেমনি পূর্ব-পরিকল্পিত উদ্দেশ্যজনক অপমানে ব্যবসায়িক ক্ষতি হলেও তা আদায়যোগ্য।

(৩) 'মেন্‌স রিয়া' বা দোষযুক্ত মন নিয়ে কিছু করলে দন্ডবিধিতে তা অপরাধ। সরল মনে, সৎ অভিপ্রায়ে, সৎ বিশ্বাসে উপকার করার উদ্দেশ্যে কিছু করলে এবং তাতে কোন জানমাল বা ইজ্জতের ক্ষতি হয়ে গেলেও দন্ডবিধিতে তা অপরাধ নয়। কিন্তু দেওয়ানী মামলায় এই সমস্ত অভিপ্রায়ের চাইতে দলিল এবং ক্ষতির উপরই জোর বেশী দেওয়া হয়। সৎবিশ্বাস, যত্ন, উপকারের ইচ্ছা, এ সমস্ত দেওয়ানী মামলায় ধর্তব্য নয়। ক্ষতি যা হয়েছে তার পূরণ বা আদায়ই দেওয়ানী মামলার উদ্দেশ্য।

(৪) ফৌজদারী মামলার বাদী সরকার হয়ে থাকে, কিন্তু দেওয়ানী মামলা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির নিজেকে দায়ের করতে হয়। ফৌজদারী মামলা সর্বজনীন এবং অন্যেরও এমন বিষয় ঘটতে পারে, সেই কারণে সরকার এটি পরিচালনা করে। কিন্তু দেওয়ানী মামলা ব্যক্তিস্বার্থের প্রেক্ষিতে হয়। তাই ব্যক্তিকেই এর খরচ বহন করতে হয়। একজন খুনীর হাতে কেউ মারা গেলে সমাজের অন্যান্যদের জন্যও এটি ভয়ের কারণ। অপরাধী জীবিত থাকলে (ফাঁসিতে না গেলে) বা প্রিভেনটিভ ডিটেনশন এ না

গেলে বা কারবাসে না গেলে অন্যের জন্য এটা ভয়ের কারণ হতে পারে। তাই ফৌজদারী মামলায় দন্ডবিধির পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি দেবার জন্য সরকার বাদীর পক্ষ হয়ে মামলার খরচ জোগায়।

(৫) ফৌজদারী মামলা দায়েরের সময়সীমা অনেকটা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত টিকে থাকে। নাবালক ছেলে সাবালক হয়ে ব্যারিষ্টারী পাশ করার পরও বাপের খুনের মামলা চাইতে পারে, কিন্তু দেওয়ানী আদালত ১২ বৎসরের স্বাভাবিক সম্পত্তি আদায়ের দাবী, ৩ বৎসরের স্বাভাবিক পাওনার দাবী এবং ১ বৎসরের ধার কর্জের দাবী না করলে তা তামাদী বা বাতিল বলে আদালত কর্তৃক বাতিল হয়। ফৌজদারী ও দেওয়ানীর জন্য আলাদা আলাদা আদালত থাকে। ফৌজদারী আদালতের জন্য মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ও দায়রা জজ থাকেন (হাইকোর্ট ও আপীলেট ডিভিশন বাদে)। দেওয়ানী মামলার জন্য জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ, সাব জজ ও সহকারী জজ (প্রাক্তন মুন্সেফ)। নরহত্যা, চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, ধর্ষণ ইত্যাদি দন্ডবিধির অপরাধ ফৌজদারী আদালতে করতে হয়, আর চুক্তিভঙ্গ, স্বত্ব পুনরুদ্ধার, ব্যক্তিগত উৎপাত ইত্যাদি মামলা দেওয়ানি আদালতে করতে হয়। চুক্তি ভঙ্গের ক্ষতি চুক্তি আইনে বিচার হয়, চুক্তি ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে আর্থিক বা অন্যান্য ক্ষতি 'টর্ট' আইনে বিচার হয়। যেমন কারো উচুঁ দালানের জন্য কারো বাড়ীর আলো বাতাস বন্ধজনিত ক্ষতি, ধানকল বা তাঁতকলের শব্দে কারো রাতের ঘুম নষ্ট হওয়ায় দিনে কাজের ক্ষতি, কারো এয়ারকন্ডিশন গাড়ীর জন্য অন্যের ছেলের মানসিকতায় তা পাবার চিন্তা ঢুকলে, না পেয়ে নৈরাশ্য এসে পড়ালেখার ক্ষতি হলে, ঐ ক্ষতিপূরণ এরূপ অবস্থা সৃষ্টিকারীর কাছে দাবী করা যায়, টর্ট আইনে। এখানে আলো-বাতাস ম্যানডেটরী ইনজাংশন দিয়ে আদালত কর্তৃক উঁচু দালানের কার্নিস ভেঙ্গে গরীবের বাড়ীতে প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা মামলার রায়ে প্রদত্ত হতে পারে।

(৬) ফৌজদারী আদালতে দন্ডবিধির আওতায় অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি দেবার জন্য হাজির করাবার দায়িত্ব প্রধানত সরকারের। দেওয়ানী মামলায় সাক্ষীসমূহকে হাজির করাবার দায়িত্ব মামলার পক্ষসমূহের। এই জন্য বাদীর উপর সমন জারী করা হয়। দন্ডবিধিতে অপরাধের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া নাই, কিন্তু ফৌজদারী কার্যবিধিতে অপরাধের নাম 'অফেন্স' দেওয়া হয়েছে এবং অপরাধ বলতে সেই সকল কার্য করা বা কার্য হতে বিরত থাকাকে বুঝায় যা সম্পাদন করলে বা করা হতে বিরত থাকলে বর্তমানে প্রচলিত কোন আইনের দ্বারা কোন ব্যক্তি দন্ডনীয় হবে। ১৮৭১ সালের গবাদি পশুর বে-আইনী প্রবেশ আইনের ২০ ধারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। হঠাৎ রাস্তার পাড়ে চরানো গো-মহিষ বা ট্রাকে বহন করা গো-মহিষ বা রাস্তায়

চরা গো-বৎসকে বাঁচাতে যেয়ে যাত্রীবাহী গাড়ী দুর্ঘটনায় পড়ে বহু জানমালের ক্ষতি হতে পারে। তাই এই আইনে রাস্তায় গবাদি পশু ছাগল ইত্যাদি ছেড়ে দেয়া অপরাধ। আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হলো যে ঃ

১। অপরাধ একটি অন্যায় ও ক্ষতিকর কাজ

২। এই অন্যায়ের জন্য থাকতে হবে দন্ডবিধিতে শাস্তির বিধান (না থাকলে তা অপরাধ নয়)

৩। অপরাধের পিছনে দোষযুক্ত মন অবশ্যই থাকতে হবে। সৎবিশ্বাস বা সরলবিশ্বাসের বিষয় অপরাধ হিসাবে প্রমাণ করা যাবে না।

৩.১ দন্ডবিধিতে শাস্তির প্রকার

দন্ডবিধিতে দন্ড ৬ (ছয়) প্রকার ঃ (১) মৃত্যু দন্ড (এটি সর্বোচ্চ শাস্তি) (২) যাবজ্জীবন কারাদন্ড (৩) বিনাশ্রম কারাদন্ড (৪) সশ্রম কারাদন্ড (৫) সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত (৬) অর্থ দন্ড ও জরিমানা। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এখন আর নাই। এর বদলে আছে যাবজ্জীবন কারাদন্ড। একটি মানুষ মোট কত দিন বাঁচবে তা বলা যায় না, তবে দায়রার একজন জজ সব ধারায় তাঁর ক্ষমতার এখতিয়ারের অধীন ৩০ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড দিতে পারেন। যাবজ্জীবন কারাদন্ড বর্তমানে ৩০ বৎসরের কারাদন্ডকে বুঝানো হয়।

যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি তার আচরণের দ্বারা শাস্তি মওকুফ বা হ্রাস করিয়ে নিতে পারে। দন্ড হ্রাসের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ও সরকারের আছে। এটি দন্ডবিধির ধারা ৫৩ (ক) ও ৫৭তে রক্ষিত। একজন লোক আদালতের মমতা থেকে বঞ্চিত হতে পারেন অনেক তথ্যের অভাবে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি বা সরকারের অনেক তথ্য জানা থাকে। অন্তর্নিহিত তথ্য সরকারের জানা থাকার পরিপ্রেক্ষিতে দন্ড প্রাপ্ত ব্যক্তি সরকার বা রাষ্ট্রপতির মায়া পেতে পারেন। এমনকি ঐ তথ্যগুলো দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিজেরও জানার বাইরে থাকতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারের রাষ্ট্রপতি। তাই প্রধান মন্ত্রীর মাধ্যমে তাঁর কাছে নথি যেতে হয়, এটি ধারা ৫৪, ৫৫ ও ৫৫ক (দন্ডবিধি) তে উল্লিখিত।

৩(২) দন্ডবিধি বাংলাদেশের কোন্ কোন্ জায়গায় প্রযোজ্য

দন্ডবিধির ধারা ৩ মোতাবেক দন্ডবিধি বাংলাদেশের আওতাভুক্ত সমগ্র এলাকায় সকল বাংলাদেশী ও বিদেশীদের উপর প্রযোজ্য। ট্রানজিটের সময় বাংলাদেশী জাহাজে বা উড়ো জাহাজে কোন বিদেশী বা বাংলাদেশী অন্যদেশে গমনকালে দন্ডবিধির বিধি ভঙ্গ করলেও সে অপরাধী হবে।

প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানই আজকের বাংলাদেশ। ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি মোতাবেক বেরুবাড়ী, লাঠিটিলা, আসালাং, আংগরপোতা বাংলাদেশের অংশ থেকে ভারতে চলে গেছে এবং দহগ্রাম ছিটমহল ভিতরে এসেছে (যদিও ভারতের মর্জির উপর তিনবিঘা করিডোরের ভিতর দিয়ে এর সংগে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়, তিনবিঘা করিডোরে ভারতীয় বাহিনী পাহারারত আছে)। সমুদ্রের মহীসোপান ও মহীঢাল ব্যতীত ৩০ নটিকাল মাইল পর্যন্ত বাংলাদেশ বিস্তৃত। এর ভিতরেই দন্ডবিধি প্রযোজ্য হবে। কোন বাংলাদেশী বাইরে থেকে কোন অপরাধ করে এলে বা বাইরে এর শাস্তি ঐ দেশের আইনে না হলেও বাংলাদেশের দন্ডবিধিতে সাক্ষ্য প্রমাণ সহকারে প্রমাণিত হলে তার শাস্তি দন্ডবিধিতে হবে। তবে পুলিশের কাছে প্রতীয়মান প্রাথমিক চার্জশীট বা পুলিশ রিপোর্ট (এফ আই আর বা এফ আর বা নন এফ আই আর) এ অথবা সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে আদালতের প্রাইমাফেসি (প্রাথমিকভাবে সত্য বলে ধরে নেওয়া) চার্জগঠন চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত না হওয়ার আগে দন্ডবিধিতে শাস্তি দেওয়া যাবে না। তখন চোরকেও চোর বললে তার মানহানির জন্য শাস্তিযোগ্য অপরাধ হবে। কারণ চোরেরও মান সম্মান আছে। আদালত দোষী সাব্যস্ত চোরকে শাস্তি দিলে চোর মাথা পেতে শাস্তি ভোগ করবে, কিন্তু কোন পাবলিক তাকে চোর বলে অপমানিত করতে পারবে না। তাতে মান হানির মামলা চলতে পারে এবং ক্ষতিপুরণ আদায়ও হতে পারে।

৪, কারা কারা দন্ডবিধিতে দন্ডিত হবেন না

(ক) রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি থাকা পর্যন্ত রাষ্ট্রের কাজে নিয়োজিত কর্মকান্ডের জন্য তিনি ফৌজদারী কার্যবিধি বা দন্ডবিধিতে দন্ডিত হবেন না এবং এটি শাসনতন্ত্র সমর্থিত। রাষ্ট্রপতি না থাকা অবস্থায় তাঁর ব্যক্তিগত কাজকর্মের জন্য তিনিও দন্ডিত হবেন। (খ) বিদেশী কূটনীতিবিদগণ দন্ডবিধিতে অভিযুক্ত হবেন না। (গ) প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রজাতন্ত্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত কাজ সম্পাদনের জন্য, বিদেশী রাজাগণ ও কুটনৈতিক কর্মচারীগণ (বাংলাদেশে বসবাসরত), যুদ্ধবন্দী, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ দেশে আমন্ত্রিত বিদেশী সৈন্যগণও এই দন্ডবিধির আওতাভুক্ত নন। তবে অপরাধ করলে অন্য আইনে তাদের বিরুদ্ধেও প্রসিডিং ড্র করে তার বিচার হবে। বিদেশীদের দেশ হতে বের করে দেওয়া যায় (বিদেশী কোম্পানীদের), কুটনীতিক এবং তাদের কর্মচারীদেরও। তাদের নিজ দেশের কাছে বা আন্তর্জাতিক আদালতে এবং কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত দেশের নাগরিক হলে Her Majesty Mother Queen Elizabeth, Privy Council এ Lord Chancellor এর নিকটও নালিশ পাঠানো যায়। কমন ওয়েলথের সদস্য হিসেবে (যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে)।

দন্ডবিধি তাই শুধু দন্ডেরই বিধি নয়, অপরাধের বিধিও। তাই ফৌজদারী কার্যবিধিতে কথাটি লেখা আছে। (ঘ) পুলিশদের বিচার হবে পিআরবি বা (পুলিশ রেগুলেশন অব বেংগল) এর আওতায় কিন্তু সেনাবাহিনীর বিচার হবে তাদের নিজস্ব আইনে এবং কোর্ট মার্শাল এর মাধ্যমে। অন্যদিকে সেনাবাহিনীতে যে সিভিল কর্মচারী আছে তাদের বিচার হবে দন্ডবিধিতেই। (ঙ) ৭ বৎসর বয়সের কম বয়সী শিশুদের বিচার 'রেলওয়ে কোড' এ থাকলেও দন্ডবিধিতে নেই। তারাও দন্ডবিধির শাস্তির বাইরে। তবে যদি প্রমাণিত হয় যে, তাদের পিছনে কোন অপশক্তি আছে, সেক্ষেত্রে তাদের বিচার এই দন্ডবিধিতেই হবে। শিশুর পরিপক্কতা ও বুদ্ধি বিবেচনার বিচারের প্রশ্ন উঠবে। (চ) সামান্য ক্ষতিকারক কাজ, যেমন তিন টাকা ঘুষ খাওয়াও কোন কোন সময়ে দন্ডবিধিতে অপরাধ ধরা হয় না। এটা বিব্রতকর অবস্থা। বাসে উঠে কারো শরীরে অনিচ্ছা সত্বেও সামান্য ধাক্কা লেগে গেল, পদার্থ বিদ্যার 'ল অফ ইনারসিয়া', অনুসারে তখন এটা নিয়ে হৈ হুল্লা করে ও অন্যান্য বিচার পয়দা করা উচিত নয়। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে বাদী হলেই কোন ব্যভিচারের বিচার হবে। স্বামী বাদী হলেন; স্ত্রী অন্যরকম সাক্ষ্য দিলেন এবং তা মিথ্যা বলে দাবী করলেন, তখন স্বামীর বিরুদ্ধে মানহানির বিচার হবে এবং তিনি দন্ডবিধির আওতায় মারাত্মক শাস্তির শিকার হবেন।

সামান্য অপরাধ নিয়ে বিচার পয়দা করলে সমাজের অন্যেরাও তাকে ছাড়বে না। তার বিরুদ্ধেও সেরূপ অপরাধ থাকলে পাল্টা বিচার পয়দা করবে। বিচার না দিলে দন্ডবিধিতেও বিচার হবে না। সমাজে তখন সবাই সুখে শান্তিতে যার যার কাজকর্ম করে বেঁচে থাকবে। তবে এক্ষেত্রে অভিপ্রায় ভাল হওয়া উচিত। অভিপ্রায় খারাপ নিয়ে তুচ্ছ অপরাধ নানা অজুহাতে বার বার করলে দন্ডবিধিতে অবশ্যই তার বিচার হবে। কাউকে পাগল বানাবার জন্যে (যে আগে পাগল ছিল না, খুবই ভাল ছাত্র বা পন্ডিত লোক ছিল) দেওয়ানী আইনের বিচারে ক্ষতিপুরণের ব্যবস্থাও হবে। একটা ভাল মানুষকেও বার বার তার নিজের দলের লোক দিয়ে পাগল-ছাগল বলালে সত্যি সত্যি সে একদিন পাগল হয়ে যেতে পারে। 'কোয়াসি সিভিল ল'তে দেওয়ানী মামলা জজ কোর্টে করলে এই পাগল বানাবার জন্য মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ আদায় করা যেতে পারে। অধুনা (এপ্রিল ১৯৯৮ ইং মাস) এই ধরনের ৬০ (ষাট) জন ভাল ও বুদ্ধিমান লোককে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে তাঁদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য পাবনার হেমায়েত পুরের মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হলে মহামান্য হাইকোর্ট তার 'সুয়োমোটো ক্ষমতায়' (কারো দরখাস্ত ছাড়াই কোন না কোন উৎস হতে খবর পয়ে স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিচারক নিজে থেকেই) হাসপাতালের প্রতি রুলনিশি জারী করে ঐ ষাট জনকে পাগল হিসেবে ভর্তি করার জন্য কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বৈষয়িক অভাব অভিযোগ, সুবিধা অসুবিধা ও আইনসংগত স্বার্থ বৈষয়িক এবং

সংসারী মানষ মাত্রেই আছে; তা কেউ পীর পয়গম্বর হোন বা মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, [পদ দুইটি শাসনতন্ত্রগতভাবে স্বার্থের পদ নয়, অনুচ্ছেদ ৫১ (৫) ও (৬)] সচিব, রাষ্ট্রপতিই হোন বা কোন খ্যাতিমান মানবই হোন। আইনের ছত্র ছায়ায় বা যুক্তিতর্কে কেউ সেই স্বার্থ আদায় করলে ন্যায়সঙ্গতভাবে তাকে স্বার্থপর এবং দুর্নীতিবাজ বলাও মানহানিকর অপরাধ। কাজের সময় তিনি ভালভাবে কাজ করবেন, ত্যাগ স্বীকার করবেন এবং স্বার্থ আদায়ের সময় তা আদায় করবেন।

বর্তমান কালে যে কোন স্বার্থ ত্যাগকেই মানুষ দুর্বলতা স্বরূপ ধরে নেয়। দেওয়ানী আইনে সময় মত পাওনা সম্পত্তি আদায় করে দখলে না গেলে তামাদি আইনে সেই অধিকারও বেদখল হয়ে যায়। নিজের জমির আল বরাবর উপরের আকাশ এবং বর্ষায় ডুবে যাওয়া পানির নিচের জমির উপরও মালিকের পূর্ণ অধিকার। নিজের গাছ পালাকে ও ঘরের টিনকে ঢেকে বসা অন্যসীমানার ডালপালা হতে রক্ষা করা চুক্তি আইনে না হলেও টর্ট আইনে ন্যায়সঙ্গত অধিকার। এতে ত্যাগ স্বীকার টর্ট আইনে দুর্বলতার সামিল। নিজের টিন ও ছাদ রক্ষা করা সহ অন্যের ডাল-পালাতে চাপা পড়া গাছকেও রক্ষা করার চিন্তা করতে হবে।

৫। অর্থ দন্ড ও কারাদন্ড একত্রে হলে অর্থদন্ড অনাদায়ে কি হবে?

অর্থ দন্ড ও কারাদন্ড একত্রে হলে অর্থদন্ড না দিতে পারলে কারাদন্ডের মেয়াদ বাড়বে, তবে মোট কারাদন্ডের মেয়াদের এক চতুর্থাংশের থেকে বেশী হবে না এবং কোন অবস্থাতেই ৬ মাসের বেশী হবে না; তবে কম হতে পারে। অর্থদন্ড বা জরিমানা মরে গেলেও মাফ হয় না। কারণ মৃতের তো সম্পত্তি থাকে এবং সেই সম্পত্তির ওয়ারিশও থাকে, তখন অর্থদন্ড তার সম্পতির ওয়ারিশদের শোধ করতে হয়। কোন সম্পত্তি না থাকলে রবিঠাকুরের ভাষায় বলা যায়ঃ "মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে" ইংরেজী প্রবাদে বলে "To pay the debt of nature" আত্মার খোরাকের জন্য অর্থ লাগে না। অর্থ দেহের কর্মশক্তি জোগায়। দেহই যখন মাটিতে মিশে গেল, পিপড়া ও পোকা-মাকড়ে খেলো, তখন ঋণের আর বাকী থাকলো কি? মরে গিয়ে দেহ পোকার খোরাক হওয়াটাইতো শাস্তি। দন্ডবিধির ধারা ৬৫ অনুযায়ী দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তি হতে জরিমানার অর্থ পরিশোধ করতে হয়, তা না হলে অর্থ আদায়ের জন্য পিডিআর এ্যাক্ট (পাবলিক ডিমান্ড রিকভারী এ্যাক্ট) এর সার্টিফিকেট মামলা তাদের বিরুদ্ধে চলবে এবং সম্পত্তি ক্রোক হবে। জরিমানা শাস্তি প্রদানের তারিখের ৬ বৎসরের ভিতর প্রদেয়। এর ভিতর মরে গেলেও তার পক্ষ থেকে ওয়ারিশদের শোধ করতে হবে।

৬। ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে গুলি করলে পুলিশের কোন অপরাধ হবে কি না ঃ-

অনেক সময় নবীন ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার গুলি ছোড়ার আদেশে সই করিয়ে নেয়। আগেই সাথে করে টাইপ করা কাগজ নিয়ে যায় বা সামনে যে কাগজ পায় তাতেই লিখে স্বাক্ষর নেয়। এটা উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার তদন্ত করে দেখার বিষয়। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে গুলি না করলে চলতো কিনা, টিয়ার গ্যাস ইত্যাদি দিয়েও বিক্ষুব্ধ জনতা ছত্রভংগ করা যেতো কিনা, এসব বিষয় অনুসন্ধান করে দেখা হয়। এফআর (এম/এফ) এবং এফআর (এম/এল) হতে পারে, ফাইনাল রিপোর্ট এ 'মিসটেক অব ল' আছে। 'মিসটেক অফ ল' থাকলে ম্যাজিস্ট্রেট দোষী হবেন কিন্তু 'মিসটেক অফ ফ্যাক্ট' থাকলে পুলিশ দোষী হবেন। তবে অভিপ্রায় সৎ থাকলে সরকারের অনুমোদন ব্যতীত কোন বিচার বিভাগীয় মামলা শুরু করা যাবে না। দন্ডবিধি ৭৭ ও ৭৮ মোতাবেক মিসটেক অফ ফ্যাক্ট এর জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে ৭ দিনের জেল দিলেন। আপীলে আসামী খালাস পেলো। তথ্য ভুল প্রমাণিত হলো। তবু ম্যাজিস্ট্রেটের কোন অপরাধ হবে না, কেননা ম্যাজিস্ট্রেট সরল বিশ্বাসে ঐ সাজা দিয়েছেন। হয়তো কোন আইনে জুরিসডিকশান নাই, তবু ম্যাজিস্ট্রেট দোষী হবেন না। ম্যাজিস্ট্রেট এর আদেশে গুলি করলে পুলিশের দোষ হবেনা। সমস্ত জবাবদিহিত্ব পড়বে ম্যাজিস্ট্রেটের উপর।

ধরা যাক, ধারা ৭৮ অনুসারে গাজীপুরের পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে নরসিংদীর আসামীকে ধরে আনলো। এতে পুলিশের দোষ হবে না, ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ আছে বলে, যদিও জুরিসডিকশান (টেরিটোরিয়াল) এর বাইরে চলে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু যেতে হলে এক্ষেত্রে সিআই (বর্তমানে এ, এস, পি,) এর অনুমতি লাগে। এর মধ্যে আসামী থানার বাইরে চলে গেলেও ম্যাজিস্ট্রেটের দোষ হবেনা, তিনি না বুঝে সরল বিশ্বাসে আদেশ দিয়েছেন বলে। কিন্তু অভিজ্ঞ পুলিশ র‍্যাংকে ছোট হলেও বিষয়টি পয়েন্ট আউট না করলে পরে দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন। ডাক্তারও যত্নসহকারে সরলবিশ্বাসে রোগী মরে যাবে জেনেও অস্ত্রোপচার করলে সরলবিশ্বাসে করেছেন বলে দোষী হবেন না। কিন্তু অন্য ডাক্তারের যোগসাজোশে ও চক্রান্তে কোন অপকর্ম করলে বা তদন্তে তা ধরা পড়লে দন্ডবিধিতে সেটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

পাগল আর প্রমত্ত ব্যক্তিরও দন্ডবিধিতে কোন অপরাধ নেই। কিন্তু যে ব্যক্তি পুলিশ দেখলে পাগলামি করে না, আবার অন্য সময় টাকা কেড়ে নিয়ে দৌড় দেয় বা পকেটে হাত দেয় সে পাগল হতে পারে না। আর সত্যিকারেই যদি কেউ পাগল হয় তবে পাগলামিটাই তার অপরাধের শাস্তি। পাগলের জীবনতো আর স্বাভাবিক হয় না, উলঙ্গ, খাওয়া-গোসল নেই, রাস্তায় খায়, ঘুমায়, কাউকে চিনে না, নিজের ঘরবাড়ী

বাসস্থান, ছেলেমেয়ে স্ত্রী-পুত্র ৫,১০, ৫০,১০০ টাকার নোট ইত্যাদি যে কোনটাই চিনে না। সত্যিকার পাগল শাস্তিতেই আছে, আই দন্ডবিধিতে তাকে আর শাস্তি দেবার বিধান নাই। ভাল ও সুস্থ ব্যক্তিকে পাগল বললে মানহানিতে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অবশ্য কেউ যদি আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করেন বা জজ কোর্টের সেরেস্তাদের কোর্ট ফি দিয়ে দরখাস্ত করেন; উক্তিকারীর ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে; জরিমানাও হতে পারে।

৭। নিচে কতিপয় অপরাধ, তাদের ধারা, শাস্তির ধারা ও অন্যান্য অপরাধ হতে পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচিত হলো ঃ

৪৪১ ধারায় সম্পত্তিতে বে-আইনী অনুপ্রবেশ ও অবস্থান। অপরাধের উপাদান সমূহ হচ্ছে (ক) অন্যের সম্পতি (খতিয়ান নং ও দাগ নং দ্বারা চিহ্নিত কোন একটি থানার কোন একটি মৌজায়) তে প্রবেশ করতে হবে (খ) প্রকৃত মালিকের বিনা আমন্ত্রণে এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রবেশ করতে হবে (গ) কোন সম্পত্তিতে বে-আইনীভাবে অবস্থান করতে হবে (ঘ) সম্পত্তির মালিককে অপমান (''তোকে আবার দাম দিব কিরে'' এই সমস্ত কথা উচ্চারণ করা), বিরক্তি (সম্পতির মালিকের মা বোনের দিকে বদনজরে চাওয়া) হুমকি (''তোর মত লোক আমি দিনে দুপুরে মেরে ফেলতে পারি'' এই ধরনের কথা উচ্চারণ করা) ও ভীতি প্রদর্শন করা (যে যে পেশার মানুষ নয়, তার বাড়ীর আশে পাশের কোথাও অন্য পেশার দুর্ধর্ষ লোক-জন এনে মারামারি বা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য এনে বসিয়ে রাখা) এই ধরনের অপরাধীদের কাজকর্মকে 'ক্রিমিনাল ট্রেস পাস' বলা হয়ে থাকে। ৪৪২ ধারাতে আছে গৃহে অনধিকার প্রবেশ, ৪৪৪ ধারাতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী সময়ে কারো চুরি করা, মেহমান বা কারো বাড়ীর শত্রু হিসাবে সংগোপনে গৃহে প্রবেশ করা (তাকে সামাজিকতার খাতিরে প্রত্যক্ষভাবে, ভদ্রতা রক্ষার জন্য লজ্জায় কিছু বলা যায় না), ৪৪৫ ধারাতে আছে সিঁদ কেটে বা দরজা ভেঙ্গে গৃহে প্রবেশ, ৪৪৬ ধারাতে রাত্রিতে গৃহভঙ্গ করে ক্রিমিনাল ট্রেসপাশ, ৪৪৭ ধারাতে অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি ৩ (তিন) মাস সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ড। ৪৪৮ ধারাতে ১ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় প্রকার দন্ড। অপরাধ সংঘটনের পর মামলার কোন সময়সীমা নাই। যখন যার উপর অপরাধ করা হয়েছে তার সামর্থ্য ও দক্ষতা যখন আসবে তখনও সে মামলা করতে পারবে।

৭ (১) অবৈধ বাধা ও অবৈধ অবরোধ ঃ

দন্ডবিধির ৩৩৯ ধারা অবৈধ বাধা এবং ৩৪০ ধারা অবৈধ অবরোধ সম্পর্কে। কারো ভয়ে কোন লোক যদি কোন সরকারী জায়গার উপর দিয়ে না গিয়ে তার গতি পরিবর্তন করে, তা অবৈধ বাধা। কোন বেসরকারী রাস্তার (জল বা স্থল পথের বেলায়) ক্ষেত্রে এ দন্ডবিধি প্রযোজ্য হবে না। তার জমি বা জলপথের উপর দিয়ে সে না-ও যেতে দিতে পারে। অবৈধ অবরোধ হচ্ছে চাকু বা লাঠি পুঁতে কাউকে বলা সেখানে বসে থাকতে, এক পাও কোন দিকে অগ্রসর না হতে দেওয়া, ৪ দিকের যে কোন দিকে। এটা দন্ডবিধির ৩৪০ মতে ফৌজদারী অপরাধ। আগেরটিতে অন্যদিক দিয়ে রাস্তা পার হয়ে চলে যেতে পারে গন্তব্যস্থলে। এইক্ষেত্রে কোন দিকে যেতে না দেওয়া। তবে পরিচয়ের অভাবে কেউ সরকারী লোককে এইরূপ আটকাতে চাইলে প্রথমে পরিচয় দিতে হবে, তারপর আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু অস্ত্র বা হাতে বল প্রয়োগ করতে হবে।

৩৪১ ধারায় অবৈধ বাধার শাস্তি হচ্ছে যে কোন মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা (যে কোন অংকের পরিমাণে) অথাব উভয়বিধ দন্ড। অবৈধ অবরোধের শাস্তি হচ্ছে ৩৪২ ধারায় ১ বৎসর মেয়াদের স্বশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন অংকের অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড।

৭(২) সাধারণ উদ্দেশ্য, সাধারণ অভিপ্রায়

কমন অবজেক্ট বা সাধারণ উদ্দেশ্য বে-আইনী সমাবেশের (৫ বা ততোধিক লোকের সমাবেশ) সদস্য হিসাবে ১ জনে কোন অপরাধ করলেও সবাই দোষী হয়। এটা পুর্বপরিকল্পিত না হয়ে হঠাৎ হতে পারে, একজন কিছু করে বা বলে বসলেই সবাই দোষী, এখানে সবাইকে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কমন ইন্টেনশন বা সাধারণ অভিপ্রায়ে সবার উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নাই। একজনে নীল নকশা বা ডিজাইন করে দিয়ে বা পরিকল্পনা করে দিয়ে দূরেও থাকতে পারে। কিন্তু কমন ইন্টেনশন এর জন্য অনুপস্থিত ব্যক্তিও সমান দোষী হবে। শ্বশুর বাড়ী গেলে সরকারী চাকুরী পেশার জামাইকে ব্যবসায়ী শ্যালক, তাদের ছেলেরা ধরে মারলো, কেউ বাধা দিলনা। কেউ ঘুষি মারলো, কেউ লাথি মারলো, কেই থাপ্পড় মারলো, কেউ লাঠি দিয়ে আঘাত করলো, কেউ বটি দিয়ে কোপ দিল। যার আঘাতেই সেই ব্যক্তি মারা যাক, সবাই সমানভাবে দোষী হবে, হাজত খাটবে, জেল খাটবে ও ফাঁসির আসামী হবে। (কারো সাথে Aggrieved বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোন ক্ষেদে কথা না বললেও) এবং রায়ের পর যে পর্যন্ত মৃত্যু না হয় সে পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলতে থাকবে। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ৩০২ ধারার সঙ্গে ৩৪ ধারা যোগ হলে কোন

আপীল চলবে না।৩৪ ধারা সাধারণ অভিপ্রায় বা কমন ইন্টেনশন সম্পর্কে এবং ১৪৯ ধারা কমন অবজেক্ট বা সাধারণ উদ্দেশ্য সম্পর্কে। ৩০২ ধারায় খুনের বা দিনে দুপুরে মেরে ফেলার বিচার হয়ে থাকে। কোলকাতা কোর্টের ১৯৭নং মামলাই এর নজির। মামলাটির নাম বরেন্দ্র কুমার ঘোষ বনাম কিং ইম্পেরার আই এল আর, ৫২ ক্যাল ১৯৭। বরেন্দ্র কামুর পোষ্ট মাষ্টার বা একজন সরকারী কর্মচারীকে মারতে গেলে বরেন্দ্রের চামচা দুইজন পোষ্ট মাষ্টারকে দুইটি গুলি করে। তাতে বরেন্দ্রের মৃত্যু দন্ড হয়। তারপর ৫জন বিচারকের বেঞ্চে পাঠালে হাইকোর্টে উক্ত সাজা বহাল রাখা হয়। তারপর বহু টাকা খরচ করে লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে পাঠালেও হিজ এক্সেলেন্সী লর্ড চেন্সেলর রায়টি বহাল রাখেন এবং বরেন্দ্রের ফাঁসি হয়ে যায় এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসিতে ঝুলতে থাকে। কোটি কোটি টাকা খরচও তাকে বাঁচাতে পারেনি। জুরীগণ যারা ঘটনার বিশ্লেষণ করেন, আইনের নয়, তারাও জজের সংগে একমত ছিলেন। এক কোর্টের রায় অন্য কোর্টেও নজির বা প্রিসিডেন্স হিসাবে ব্যবহার চলে। রায় ও একমতই হয় (Obiter Dicta বা Precedence) বিচার্য বিষয়, সিদ্ধান্তের কারণ রায়ে উল্লেখ থাকে। এটাই দিনে দুপুরে খুনের পরিণতি। গুলি না করেও চামচাদের হাতে কাজ করেও ফাঁসিতে যেতে হয়।

প্ররোচনা বা এ্যাবেটমেন্ট এর ক্ষেত্রে অপরাধ দন্ডবিধির ১০৭ ধারায়, আত্মরক্ষার অধিকার সম্পর্কে ৯৬-১০৬ ধারা পর্যন্ত বলা আছে। আত্মরক্ষার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো সম্পর্কে বলা আছে ১০৩ হতে ১০৬ ধারায়। আত্মরক্ষার অধিকার শুরু হয় আক্রমনের মুহুর্ত হতে এবং শেষ হয় আক্রমণ শেষ হবার পরেই। অনেকদিন পর অন্যস্থানে যখন আক্রমণ নাই, তখন আত্মরক্ষার অধিকারের অজুহাতে কাউকে আক্রমণ করা যাবে না। এটি ১০২ ধারা।

৯৬ ধারা বলে ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষার জন্য কোন কার্যই অপরাধ নয়, ৯৭ ধারা বলে শরীর ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার সবার আছে। ৯৮ ধারা অপরিণত বুদ্ধি, অসুস্থব্যক্তি, অল্প বয়স্ক, নেশাগ্রস্থ, বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করা যায়।

৭ (৫) মৃত্যু ও গুরুতর জখমের ক্ষেত্র ব্যতিত সরকারী কর্মচারীর সরল বিশ্বাসের অন্যায় কাজের সময় ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থার প্রয়োগ করা যাবে না। আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু ক্ষতিসাধন দরকার ততটুকুই ক্ষতিসাধন করতে হবে। বেশী করলে অপরাধ হবে। কেউ বটী দয়ি কোপ দিতে এলে তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে বটী হাত ছাড়া করা যাবে। সরকারী কর্মচারী সম্পর্কে আক্রমণকারীর ধারণা না থাকলে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তার উপর শারীরিক বল প্রয়োগ করা যাবে কর্তব্যরত অবস্থায়।

৭ (৬) দন্ডবিধি ১০০ ধারা মোতাবেক দেহগত আত্মরক্ষার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো যায় ঃ (ক) মৃত্যুর আশংকার ক্ষেত্রে (খ) গুরুতর আঘাতের আশংকার ক্ষেত্রে (গ) ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আক্রমণের ক্ষেত্রে (ঘ) অস্বাভাবিক কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আক্রমণ (ঙ) শিশু বা নারীহরণের উদ্দেশ্যে আক্রমণ (চ) অবৈধ আটক করার উদ্দেশ্যে হামলা।

৭(৭) মৃত্যুর সম্ভাবনা না থাকলে মৃত্যু ব্যতীত অন্য যে কোন ক্ষতি করা যায়, এটি ১০১ ধারা। ১০৩ ধারায় নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সম্পত্তি রক্ষার ব্যক্তিগত অধিকারে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটানো অপরাধ নয়, (ক) দস্যুতার ক্ষেত্রে (খ) রাত্রিকালে গৃহভংগ (গ) অগ্নি সংযোগ দ্বারা ক্ষতির ক্ষেত্রে (ঘ) মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে।

৮। চুরি ও ছিনতাই

যদি কোন সময় কারো দখল হতে তার সম্মতি ব্যতীত কোন অস্থাবর সম্পত্তি স্বেচ্ছায় অসৎ উদ্দেশ্যে গ্রহণ করার জন্য এক স্থান থেকে কেউ অন্য স্থানে স্থানান্তর করে, তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি চুরি করেছে বলে গণ্য হবে। কুরআন শরীফে চুরির শাস্তির কথা বলা থাকলেও চুরি কাকে বলে তা বলা নাই। এখানে বলা আছে চোরাই মাল উদ্ধারের জন্য চুরি করে দৌড়ে পালাবার সময় যে পর্যন্ত তাকে দেখা যায় সে পর্যন্ত পায়ে গুলি করা যাবে সম্পত্তি রক্ষার অধিকারে। পরে গুলি করা যাবে না বা মারা যাবে না। স্থানান্তর না করলে চুরি হবে না। অসৎ উদ্দেশ্যে না হলে চুরি হবে না। ভবিষ্যতে নিজের অংশীদারিত্বের মাল হলেও চুরি হবে না (মোম্বাই হাইকোর্টের রায়ে নজির আছে)। ভাইয়ের জলসেচের দোন একগ্রামে পড়ে থাকতে দেখে সদুদ্দেশ্যে ভাইকে তা বাড়ীতে পৌছে দেবার জন্য নিয়ে গেলে সেটিও চুরি হবে না। পথের কুড়ানো জিনিস কারো দখলের জিনিস না হলে তা চুরি হবেনা, তবে হাতের আংটিতে পরিচিত নাম লেখা থাকলে তা তাকে পৌছে না দিলে বা নাম লেখা মানিব্যাগ পরিচিত স্থানে পৌছে না দিলে অপরাধমূলক আত্মসাৎ করলে তার নাম হবে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ। কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন ব্যক্তির আগের অভিজ্ঞতা না থাকলে তাকে অসুস্থ, সংজ্ঞাহীন বা উন্মাদ বা টোটালী ইনসেন্স মনে করে চুরির অপরাধ অবুঝ শিশুর মতই মাফ করে দেবার নজির আছে। এটা উচ্চ আদালতের নজিরে পরিদৃষ্ট হয়েছে। কোন ষড়যন্ত্রমূলক বড়শীর আধারের (টোপ) মত জিনিস খাওয়াও ইনসেনিটি, এর পিছনের রাজনীতি কার্যক্রম, চালাকী, দূর্নীতি ইত্যাদিও আগে বুঝতে হবে। যে না বুঝবে তার বেলায় তা চুরির অপরাধে গণ্য হবে

না। যেখানে কোন শারীরিক কাজ বা আর্থিক বা মানসিক কনট্রিবিউশন নাই, সেখানকার কিছু খাওয়াই বড়শীর আধার টোপ, এটা যে না বুঝে সেই ইনসেল।

দন্ডবিধির ৩৮৩ ধারাতে আছে বলপূর্বক বা প্রলুব্ধ করে ভয় দেখিয়ে সম্পত্তি বা মূল্যবান দলিল বা সীল ছিনতাই এর ঘটনা। ৩৭৮ ধারায় সাধারণ চুরির অপরাধ সংঘটিত হয়। ৩৭৯ ও ৩৮০ ধারাতে চুরির শাস্তির বিষয় উল্লেখ আছে। ৩৭৯ ধারাতে ৩ বৎসর এবং ৩৮০ ধারাতে ৭ বৎসর মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ড অথবা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হওয়ার বিধান আছে। ৩৮৩ ধারায় বলপূর্বক অপরাধের জন্য ও ৩ বৎসর মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড, কিন্তু গুরুতর আঘাতের জন্য ১০বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড হতে পারে। এটি সর্বোচ্চ দন্ড। সর্বনিম্ন দন্ড হাকিমের ইচ্ছাধীন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। তিনি যদি মনে করেন অপরাধী খুবই আনাড়ী ও অনভিজ্ঞ, তিনি সর্বনিম্ন ১ দিনের কারাদন্ডও শাস্তি দিতে পারেন।

পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক কোন দস্যুতা সংঘটিত হলে তাকে ডাকাতি হিসাবে আখ্যা দেয়া যায়। এটি একটি যৌথ অপরাধ। এর ধারা ৩৯১। ৩৯০ ধারায় হয় দুস্যতা। সকল ডাকাতিতেই চুরি ও দস্যুতা আছে। সদস্য ৫ বা ততোধিক হলেই তা ডাকাতি, কম হলে দস্যুতা।

সকল দস্যুতা বা Robbery চুরি ও বলপূর্বক সম্পত্তি গ্রহণ হয়। ৩৭৮ধারায় চুরি এবং ৩৯০ ধারায় দস্যুতা বা রাহাজানি সংঘটিত হয়। ৩৫৯ হতে ৩৬১ ধারা কিডন্যাপিং এবং ৩৬২ ধারা এ্যাবডাকশন সম্পর্কে। কিডন্যাপিং হচ্ছে বলপূর্বক অপহরণ, এ্যাবডাকশন হচ্ছে প্রতারণামূলক অপহরণ। কিডন্যাপিং দুই প্রকার। বাংলাদেশ হতে অপহরণ (তখন দেশের দায়িত্ব উদ্ধার করার) এবং আইনানুগ অভিভাবক হতে সম্মতি ব্যতীত অপহরণ। বর্তমানে বালকের ক্ষেত্রে বয়স ১৮ বছরের কম বয়স্ক এবং বালিকার ক্ষেত্রে ২১ বছর বয়স্কা (অন্য তথ্যে আছে বালক ১৪, নাবালিকা ১৬ বছর বয়সের)।

৯। এ্যাবডাকশন ও কিডন্যাপিং

এ্যাবডাকশন বা প্রতারণামূলক অপহরণ। কিডন্যাপিং এ অপহৃত ব্যক্তির সম্মতি বিবেচিত হবে না। সে নাবালক, হাবাগোবাও হতে পারে। এ্যাবডাকশন এ অপহৃত ব্যক্তির সম্মতি থাকলে আদালতে তা বিবেচনা যোগ্য। একজন বৃদ্ধ লোককেও এ্যাবডাকশন করা যায়। কিডন্যাপিং এর ক্ষেত্রে বিকৃতমস্তিষ্ক নাবালক ইত্যাদিও হতে পারে। কিডন্যাপিং মূল অপরাধ। এ্যাবডাকশন সাহায্যকারী অপরাধ।এর পর তাকে

ধর্ষণ, হত্যা তার স্বাক্ষর গ্রহণ, ইত্যাদিও হতে পারে। ৩৬৩ ধারাতে কিডন্যাপিং এর শাস্তি ৭ বৎসর কারাদন্ড (সশ্রম বা বিনাশ্রম)। এ্যাবডাকশন মূল অপরাধ নয়। ছেড়ে দিলে এবং অপহৃত ব্যক্তির সম্মতি প্রমাণিত হলে অপহৃত ব্যক্তির মুখজবানী অনুসারে বা ঘটনা তদন্ত সাপেক্ষ ধর্ষণই হয়েছে, হত্যাই করেছে না অন্য কিছু। ৩৬৪ ধারামতে খুন করার উদ্দেশ্যে উঠিয়ে নিয়ে গেলে, দোস্ত দিয়ে প্রতারণা করে, লোভ দেখিয়ে, শাস্তি ১০ বৎসর কারাদন্ড হতে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডও হতে পারে। সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে কোন আঘাত করে বা অন্যভাবে হত্যা করাই খুন এবং দন্ডবিধিতে এটি ৩০০ ধারা কিন্তু 'ক্যালপ্যাবল হমোসাইড' বা অপরাধজনক নরহত্যা বা নিম্খুন দন্ডবিধির ২৯৯ ধারা। এতে খুনের পূর্বপরিকল্পনা নাই কিন্তু আঘাত অতিমাত্রায় হওয়াতে বা ঘটনা বেসামাল হওয়াতে খুন হয়ে যায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ইকবাল যৌন অপরাধ করার পরে সালেহাকে সামলাতে পারলে খুন করতো না, এটিই নিমখুন বা অপরিকল্পিত খুন "Calpable Homocide : All Murders are culpable homocide but all culpable homocides are not murders" বা সব খুনই অপরাধজনক নরহত্যা কিন্তু সব অপরাধজনক নর হত্যাই খুন নয়। ৩০৪ ধারানুসারে অপরাধজনক নরহত্যার শাস্তি ১০ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড, বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড হতে পারে। কিন্তু ৩০২ ধারানুসারে খুনের অপরাধে মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড হতে পারে।

১০। আঘাত সংক্রান্ত ধারা

এটি দন্ডবিধির ধারা-৩১৯। গুরুতর আঘাত করলে ১ বছর পর্যন্ত সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড হয় (স্বেচ্ছায় যদি আঘাত করে, অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে করলে নয়)। ৩২৫ ধারায় ইচ্ছাকৃত গুরুতর আঘাতের শাস্তির কথা উল্লেখ আছে এবং তা হলো ৭ বৎসর পর্যন্ত মেয়াদের সশ্রম ও বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড। নিম্নলিখিত অপরাধগুলো গুরুতর আঘাত ঃ
(১) পুরুষত্বহীন করা (২) স্থায়ীভাবে চোখের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করা (৩) স্থায়ীভাবে কর্ণের শ্রবণশক্তি বিনষ্ট করা (৪) যে কোন অঙ্গের বা গ্রন্থির অনিষ্ট, বিকৃতি বা ক্ষতিসাধন করা (৫) অঙ্গ বা গ্রন্থির শক্তি স্থায়ীভাবে বিনাশ বা পঙ্গু করা (৬) মাথা বা মুখ মন্ডলের বিকৃতি ঘটানো (৭) হাড় ও দন্ত ভাঙ্গা বা স্থানচ্যুত করা (৮) যে আঘাত জীবন বিপন্ন বা দুর্ভোগের সৃষ্টি করে, যে আঘাত ২০দিন পর্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা দেয় বা স্বাভাবিক কাজকর্ম করে খেতে দেয় না, হাসপাতালে রাখে, তাই গুরুতর আঘাত।

১১। ধর্ষণ ও ব্যভিচার

দন্ডবিধির ভাষায় ধর্ষণ (Rape) ও ব্যভিচার (Adultry) দু'টি ভিন্ন প্রকৃতির অপরাধ। ধর্ষণের বিচারের ক্ষেত্রে ৩৭৫ ধারা এবং ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ৪৯৭ ধারা মূলে দন্ড প্রদান করা হয়।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহ ধর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হয় ঃ

ক) কোন মহিলার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনাচার করলে

খ) মহিলার সম্মতি ব্যতিরেকে যৌনাচার করলে

গ) প্রতারণার মাধ্যমে মহিলার সম্মতি আদায় করলে (যেমনঃ বিবাহের আশ্বাস, দেবতা/চন্দ্র/সূর্য স্বাক্ষী রেখে নিভৃতে বিবাহের ভাণ করলে, প্রভৃতি ক্ষেত্রে)

ঘ) ১৪ বছরের কম বয়সী কোন কিশোরীর সঙ্গে যৌনাচার করলে এতে কিশোরীর সম্মতি থাকলেও কিংবা বেশ্যা বাড়ীতে অর্থের বিনিময়ে হলেও তা ধর্ষণ বলে গণ্য হবে। এমনকি ১৪ বছরের কম বয়সী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসও ধর্ষণ বলে গণ্য।

ঙ) স্ত্রীর সঙ্গে অস্বাভাবিক যৌনাচার (যেমনঃ পুং মৈথুন, পাশবিক সঙ্গম, প্রভৃতি) করলে। এখানে উল্লেখ্য যে, বেশ্যাবৃত্তি বাংলাদেশ দন্ডবিধি অনুযায়ী আইনের দ্বারা স্বীকৃত নয়। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এফিডেভিট করে বেশ্যাবৃত্তির অনুমতি গ্রহণ আইনসিদ্ধ নয় (যদিও তা কখনও কখনও করা হয়ে থাকে)।

ব্যভিচারের ক্ষেত্রসমূহ কিছুটা ভিন্ন ধরনের, যদিও তা প্রকারান্তরে ধর্ষণেরই প্রকার বিশেষ।

ব্যভিচারের ক্ষেত্র নিম্নরূপ ঃ

ক) স্বামীর সম্মতি ব্যতিরেকে অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর যৌনাচার

খ) স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে স্বামী কর্তৃক অন্য কোন পুরুষ দ্বারা স্বীয় স্ত্রীকে যৌনকর্মে লিপ্ত করণ।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সম্মতিক্রমে যদি অন্য কোন পুরুষকে এরূপ যৌনাচারের সুযোগ প্রদান করা হয়, তাহলে তা ইউরোপীয় দেশসমূহে ব্যভিচার হিসেবে গণ্য হয়না। কিন্তু বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এটিও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত।

৩৭৬ ধারানুসারে ধর্ষণের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ১০ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড প্রযোজ্য হয়। ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ৪৯৭ ধারানুসারে ৫ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড দেয়া যেতে পারে।

১২। মানহানি

মানহানীর ধারা ৫০০ এবং ৫০১। কোন মহিলার স্বামী যদি কারো বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ দাঁড় করায় এবং মহিলাটি যদি আত্ম সন্মান রক্ষার জন্য ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করে (ধর্ষণকারীর মহব্বতে নয়) তখন যার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে সে মানহানির মামলা করতে পারে, তখন মামলা দায়েরকারী বা অভিযোগকারী স্বামীর মানহানির অভিযোগে দীর্ঘ মেয়াদী কারাভোগের (৭ বৎসর) প্রয়োজন হতে পারে। এমনকি অর্থদন্ডও হতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে অপরাধ প্রমাণ না করতে পারলে মানহানির মামলায় ক্ষতিপূরণ দিতে হতে পারে; দেওয়ানী আদালতে সত্য প্রকাশের জন্য কারো মেয়ে বিয়ে না হলে বা মেয়ের বিয়ে নষ্ট হলে ইত্যাদি। ফৌজদারী মামলায় ঘটনা প্রমাণ করতে পারলে কোন চিন্তার কারণ নেই।

১৩। এ্যাডভোকেটদের বার কাউন্সিলের মত সাংবাদিকদের প্রেস কাউন্সিল আছে। দেশ, দশ ও সমাজের মানুষের জন্য এ্যাডভোকেটদের মত সাংবাদিকদেরও দায়িত্ব আছে। কোন সাংবাদিক কারো পক্ষে মানহানির কথা লিখতে যাচ্ছে জানলে লেখার বিরুদ্ধেও অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বা ইনজাংশন জারীর ব্যবস্থা করা যায়। তারা অন্যায় করলে বার কাউন্সিলের মত তাদের বিরুদ্ধেও সাসপেনশন বা ডিসমিজাল ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া যায়। তাই সাংবাদিকতা নিরপেক্ষ ও ন্যায়নীতিভিত্তিক হওয়াও বাঞ্ছনীয়। আইন আদালত কোর্ট কাচারী বা সাংবাদিকদের কাছে যে তথ্য নেই, সরকার, রাষ্টপতি ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন কমনওলেথ, প্রিভি কাউন্সিল, লর্ড চ্যান্সেলর ও মহামান্য রাণী'র নিকট সে তথ্য থাকতে পারে। তাই এঁদের সুপারিশে মৃত্যুদন্ডের আসামীও খালাস প্রাপ্ত হতে পারে। দেশের ইতিহাসের বহু পুরানো ঘটনা ও বিশ্লেষণ আইন আদালত ও সাংবাদিকতায় আসল সিদ্ধান্ত বা নিরপেক্ষ রায় প্রদানের জন্য প্রয়োজন। যে সমস্ত তথ্য ও আইনকানুন ও ঘটনার সাক্ষী বা দলিল খুবই দুস্প্রাপ্য, প্রতারণার সম্ভাবনাই সেক্ষেত্রে বেশী, এই সম্পর্কেও দন্ডবিধিতে বিধান আছে।

১৪। সরকারী কর্মচারীদের উপর প্রযোজ্য এবং সকল কর্মচারীদের অবশ্য জ্ঞাতব্য দন্ডবিধির কতিপয় ধারা এতদসঙ্গে নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

দন্ডবিধিতে ঘুষকে বলা হয় গ্রাটিফিকেশন। ১৬১ ধারামতে নিজ হাতে ঘুষ নেওয়া ও ১৬২ ধারাতে পিওন বা দালালের হাতে ঘুষ নেওয়া, ১৬৩ ধারাতে গণপ্রতিনিধি কর্তৃক

প্রভাব খাটিয়ে জনসেবা করে দিয়ে বিনিময়ে কিছু নেওয়া, ১৬৪ ধারা প্রলুব্ধকারী বা গুন্ডা দিয়ে কোন মারপিট করানো বা হত্যা করানো। ১৬৩ ধারার অপরাধ বিনাশ্রম কারাদন্ড, অর্থদন্ড বা উভয়বিধ দন্ড। ১৬৫ ধারাতে ব্যবসায়ের জন্য আট হাজার টাকার টিভি দুই হাজারে দেওয়াও ভ্যালুয়েবুল জিনিষ কমদামে নেওয়ার জন্য উপহার গ্রহণের সামিল অপরাধ। ১৬৬ ধারা ন্যায্য পাওনার চেয়ে কম দেওয়া। দলিল কম দামে রেজিস্ট্রী করা হাকিমের অপরাধ (হাকিম অর্থ সাব রেজিষ্ট্রার)। ১৬৭ ধারায় কারো স্বার্থ বিরোধী ইচ্ছাকৃত ভুল করে দলিল নকল করাবার অপরাধ। ধারা ১৬৮ স্বনামে বা বেনামে সরকারী কর্মচারীর নিলাম ডাকার অপরাধ (নিজ অফিসের আওতাধীন মাল বা হাট বাজার, বাগান বা ব্যবসায়ের)। ধারা ১৬৯ নিলামের দাম বাড়াবার জন্য সরকারী কর্মচারীর নিলাম ডাকার অপরাধ। ১৭০ ধারা ভুয়া ছাপ লাগিয়ে এ্যাকশনে গেলে ২ বৎসর কারাদন্ড, এ্যাকশনে না গেলে নয়। ১৭১ ধারা ভূয়া ছাপে দাম বাড়ালে তিনমাস কারাদন্ড। ধারা ১৭৯ সরকারী কর্মচারীর (পেশাগত কাজে প্রশ্ন করলে) প্রশ্নের জবাব না দেয়ার বা তথ্য না দেবার জন্য অপরাধ। ধারা ১৮৬ সরকারী কর্মচারীকে তার কাজে বাধা দেয়ার অপরাধ। ধারা ১৮৯ সরকারী কর্মচারীকে ভয় দেখানোর অপরাধ। ৩২৩ ও ৩২৫ ধারা আঘাত ও গুরুতর আঘাতের অপরাধ। এন্টিকরাপশন আইনের ৫ ধারাতে দুর্নীতির শাস্তি। নিয়োগ কর্তৃপক্ষ ও সচিবের অনুমতি নিয়ে তদন্ত করতে হবে। দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মকর্তা, কর্মচারীরা ভূয়া প্রমাণিত হলে এবং দুর্নীতিবাজ হলে তাদের দিয়ে কাজ করানোটাইতো বিপদজনক। সরষেতে ভূত থাকলে এবং ওঝাকে সাপে কাটলে ভূত তাড়ানো এবং বিষ নামানোটাইতো হবে অসম্ভব ব্যাপার।

১৩। বাংলাদেশে আরোপযোগ্য বিধির পর্যালোচনা

ব্রিটিশ আমলে দন্ডবিধি যে কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার ২০ বৎসর পর পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এখন এর কার্যকারিতার কোন সময়সীমা নেই। অপরাধ সংঘটিত হবার ১০০ বছর পরও তদন্ত কার্য শেষে সাক্ষী সাবুদে প্রমাণিত হলে অপরাধীর শাস্তি হতে পারে। সময়ের বিবর্তনে কমজোর পার্টি ক্ষমতায় এসে তাদের সদস্যদের উপর ঘটিত অবিচারের প্রতিশোধ নিতে পারে। বিচারের অন্যান্য উদ্দেশ্যের ভিতরে সংশোধন, প্রতিশোধ এবং অপরাধটি যাতে আর না ঘটে তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদিও জড়িত। নাবালক সন্তান বড় হয়ে তার পিতার প্রতি কৃত অবিচারের ও প্রতিশোধ এইভাবে নিতে পারে। মিথ্যা সাক্ষ্য দাঁড় করিয়ে নিরপরাধকেও অনেক সময় শাস্তি দেয়া হয়, তাকে দিয়ে কোন অন্যায় কাজ করানো সম্ভবপর না হলে। সমাজের বিভিন্ন যুগে এসব ঘটনাও ঘটে। তাই ব্রিটিশ আমলের ২০ বছরের

পরিবর্তে এখন দন্ডবিধির কার্যকারিতার সময় সীমার চৌহদ্দী উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে কোন লোক যদি সময়ের বিবর্তনে নিযামুদ্দিনের মত আউলিয়াও হয়ে যায়, তবু তার বিরুদ্ধে অতীতে করা অপরাধের জন্য যদি কেউ বাদী হয়ে আদালতে মামলা রুজু করে এবং সেই অপরাধ যদি সাক্ষী সাবুদে প্রমাণ করা যায় এবং অপরাধীকে জীবিত অবস্থায় সমন ওয়ারেন্ট ক্রোকী পরোয়ানা বা হুলিয়া দিয়ে আদালতে হাজির করে বিচার করা যায়, তখনও তার কৃতকর্মের বিচার শতবর্ষ পরেও চলতে পারে এবং অপরাধীর শাস্তি হতে পারে। পাপীকে শাস্তি পেতে হবেই এটা বর্তমান অবস্থায় দন্ডবিধি কার্যকর করার নীতি। বর্তমান সমাজে সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য মানুষ পশুর মত আচরণ করে বলেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৪। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দন্ডবিধি

বাংলাদেশের ভৌগোলিক মানচিত্রের ভিতরই দন্ডবিধি কার্যকর বলে এটাকে বাংলাদেশ দন্ডবিধি বলা হয়ে তাকে, যদিও মূল দন্ডবিধি ব্রিটিশদের দ্বারা প্রণীত এবং তা ব্রিটিশ কমনওয়েলথ এর প্রায় সকল রাষ্ট্রেই প্রযোজ্য। আমেরিকার দন্ডবিধি বাংলাদেশে গ্রহণযোগ্য হবে না; এমনকি ওখানকার ব্যবস্থার কথা আমাদের মত সমাজে মুখে পর্যন্ত উচ্চারণ করা যাবে না। হোমোসেক্সচুয়ালিটি সম্পর্কে আমেরিকায় নতুন ব্যবস্থা গৃহীত হয়ে থাকে সমাজের ডিমান্ড-এ হস্তক্ষেপ না করার জন্য এবং অতীতের অপরাধ ধরে বর্তমানে বিচার কার্যকর না করার জন্য। অতীতে যে পরাজিত বর্তমানে সে বিজয়ীও হতে পারে। বর্তমানে বিজয়ী হয়ে সাক্ষী সাবুদে অতীতের কোন অপরাধ প্রমাণিত করে বর্তমানে বিচার দাঁড় করানো যাবে না; শাস্তিও দেয়া যাবে না।

অপরাধ অনেক অবস্থায় সংঘটিত হয়ে থাকে। যে অবস্থায়ই সংঘটিত হোক না কেন প্রাথমিক পর্যায়ে বিচারের রায়ে অপরাধের জন্য শাস্তি হবেই। শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনে আপীল করেন তখন অবস্থার বিশ্লেষণে তিনি মুক্তি পেতেও পারেন। দশজনের সাথে তিনিও যদি এক বোঝা কলাই নেন, দশজন মুক্তি পেয়ে গেল তিনি তখন সাধারণ ক্ষমায় মুক্তি পেয়ে যেতেও পারেন। অপরাধের বিরুদ্ধে হেদায়েত করতে করতে, বাধা দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত কথা মানাতে না পেরে কেউ নিজেও সেই অপরাধের চেষ্টা করে বসলেন। অপরাধের চেষ্টা করাও অপরাধ। তখন অপরাধ করলে যে শাস্তি, চেষ্টার জন্য তার অর্ধেক শাস্তি হবে। কোন পুরুষ যদি কোন মহিলার হাত ধরে তাকে সাহায্য করে থাকেন, কোন কাজ করতে অথবা আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে থাকেন বা সেক্সবিহীন মন নিয়ে মুখে চুমু খেয়ে থাকেন, তা প্রাথমিক পর্যায়ে শাস্তি যোগ্য অপরাধ হলেও আপীলের বিচারে অবস্থা বিশ্লেষণে তিনি মুক্তি পাবেন। কেউ যদি ত্যাক্ত বিরক্ত হয়ে অপরাধীকে

অপরাধ হতে সরাতে না পেরে অথবা নিরপরাধকেও সন্দেহে অপরাধী মনে করে তার উপর অপরাধ করার চেষ্টা নেন, আপীলের বিচারে তিনিও মুক্তি পেতে পারেন। সুতরাং কারো উপর দন্ডবিধি আরোপের সময় এসব দিকে লক্ষ্য রাখা সুবিচারের স্বার্থে একান্ত দরকার। অপরাধটি স্বতস্ফুর্ত ভাবেই করা হলো, না ষড়যন্ত্র করে অবস্থার শিকারের উপর ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার মত অবস্থায় করানো হলো, সেটাও ধর্তব্য বিষয়। অবস্থার বিচ্যারে এসব ক্ষেত্রেও অপরাধী মুক্তি পেতে পারে। ''দোয়াতের ভিতর কলম; ''সূচের ভিতর সুতা'' এই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েই জুরীর বিচারে আগে ব্যভিচার, ধর্ষণের অপরাধ প্রমাণ করানো হতো। যদি বাইরে কোন ঘটনা সংঘটিত হয়ে থাকে, তাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে তার একটু হাল্কা শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো, যদি আদালতে বিচার প্রার্থী হয়ে সাক্ষী সাবুদে তা প্রমাণ করানো যেতো। তেমনি বিবেচক অনুপ্রবেশকারীর এবং বেপরোয়া ভোগসম্ভোগের রায়ও হয় ভিন্ন ধরনের। বিষয়টি একতরফা না দুই তরফা। কোন বিনিময় গ্রহণ করা হয়েছে বা ভোগ করা হয়েছে কিনা ইত্যাদিও ধর্তব্য বিষয়। কোন রাজনৈতিক অধিক্ষেত্র সৃষ্টির জন্য, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এসব করানো হচ্ছে কিনা এসবও তদন্তের বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাঁচার অধিকারে শাসনতান্ত্রিক মানবাধিকারের দাবী সবারই আছে। সুতরাং শাসনতান্ত্রিক রাজনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক দৃষ্টিও তদন্তের বিষয় হতে পারে।

১৫। উপসংহার

'রোমান ল' মুসলিম ল'তে সংশোধিত হয়ে পরবর্তীকালে নেপোলিয়ানিক কোডে (আইনের সমষ্টিই কোড) পরিবর্তিত হয়ে ব্রিটিশ ল'তে আধুনিকরূপ লাভ করে। কোলকাতা, বোম্বে (বর্তমানে মোম্বাই) ও মাদ্রাজ প্রেসিডিসিতে কিছু কিছু সংশোধিত ব্রিটিশ আইন কার্যকরী হলেও অত্র উপ-মহাদেশে সিপাহী বিপ্লবের পরে দন্ডবিধি এবং ফৌজদারী কার্যধারা পুরোপুরি কার্যকরী হয়।মেকলে সাহেব সহ বিভিন্ন সাহিত্যিকগণ আইনের বইগুলি সম্পাদনা করেন। আপীল করতে হতো লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলের লর্ড চ্যান্সেলরের কাছেই। রোমান ল'তে চুরির শাস্তি ছিল মৃত্যুদন্ড এবং কাজের মেয়ে বা ছেলের সাথে ধর্ষণে লিপ্ত হলে অতি উপরের স্তরের মানুষকেও কাজের মেয়ে বা ছেলের স্তরে নামিয়ে দেয়া হতো। তাদের সুখ দুঃখের ভাগী হয়ে তাদের স'থে চলতে হতো রাজনীতি করতে হতো। মুসলিম ল'তে চুরির শাস্তি হাত কেটে দেয়া এবং পরবর্তীতে ব্রিটিশ ল'তে এটি আরো সংশোধিত ও লিবার‍্যাল হয়। অতি অভাবেই মানুষ কাজ না পেলে চুরি করে, ইত্যাদি বিবেচনা করে চোরের গায়ে হাত না দেয়ার আইন তৈরী হয় এবং চোর চুরির সময় যতটুকু আঘাত করেছিল তার

চাইতে বেশী আঘাত না করার আইন তৈরী হয়। চোরকে চোর বলে অপমানিত না করার Precedence প্রবর্তিত হয়।

অবস্থার সংগে এবং সামাজিক অবক্ষয়ের সংগে খাপ খাইয়ে আমাদের আইন কানুন এখন সংশোধিত হওয়া উচিত। ভারতে কিছু কিছু সংশোধিত হলেও আমরা এখনো ব্রিটিশদের তৈরী করা আইনই অনুসরণ করে যাচ্ছি। মানুষ যখন সামনে অগ্রসর হয়, কিন্তু আইন পিছনে পড়ে থাকে, তখনি মানুষ বিপ্লব করে। আমাদের শান্তি এবং জানমাল ইজ্জত রক্ষার স্বার্থে আমাদের দন্ডবিধি, ফৌজদারী কার্যধারা, দেওয়ানী আইন, চুক্তি আইন, টর্ট আইন, কোম্পানী এ্যাক্ট ইত্যাদি সংশোধিত হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্বলের উপর যেন সবলের অত্যাচার না বাড়ে সেদিকে আইন প্রণয়ন কারীদেরও লক্ষ্য রাখা উচিত।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ

১। রহমান, শামসুর গাজী, (১৯৮৮) *দন্ডবিধির ভাষ্য* ,তৃতীয় সংস্করণ, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১।

২। Prof. Khan, A, A. *The Bangladesh Penal Code*. Publisher Khushroz Kitab Mahal, 15 Bangla Bazar, Dhaka-1.

৩। অধ্যাপক খান এ, এ, *চুক্তি আইন ও টর্ট*, কামরুল বুক হাউজ, ৪৬নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১।

৪। অধ্যাপক খান এ, এ, *দেওয়ানী আইন ও তামাদি আইন*, কামরুল বুক হাউজ, ৪৬ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১।

৫। অধ্যাপক খান এ, এ,*(১৯৮৬), ফৌজদারী কার্যবিধি* কামরুল বুক হাউজ, ৪৬ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১।

৬। *বাংলাদেশের সংবিধান* (অনুচ্ছেদ ৫১ এর (৫) ও (৮